

## বিজ্ঞান, বিজ্ঞানমনস্কতা বনাম কৌরাণিক বিজ্ঞান

-জাহেদ আহমদ

ই-মেইলঃ worldcitizen73@yahoo.com

বিশ্ব যখন এগিয়ে চলেছে  
আমরা তখন ও পিছে,  
বিবিতালাকের ফতোয়া খুঁজছি  
হাদীস ও কৌরাণ চষে।

.....  
বাহিরের দিকে যত মরিয়াছি  
ভিতরের দিকে তত,  
গুনতিতে মোরা বাড়িয়া চলেছি  
গরু-ছাগলের মত।

-নজরুল

### এক:

ইন্টারমিডিয়েট লেভেলে কলেজের ইংরেজী এন্ট্রলজিতে পড়া একটি গল্প আমার মনকে খুব নাড়া দিয়েছিল। অনেকেই গল্পটির কথা জেনে থাকবেন। আমেরিকান লেখিকা মারজারি কিনান রাওলিন্স এর 'এ মাদার ইন ম্যানভিল' (*A Mother in Manville*)। কাহিনী এ রকম- লেখালেখি বিষয়ক একটা এসাইনমেন্ট-এর কাজে লেখিকা মারজারি নর্থ ক্যারোলিনার পাহাড়ে অবস্থিত একটি অনাথ বাচ্চাদের আশ্রমে কিছুদিন কাটান। সেখানে জেরি নামে একটা বাচ্চার সাথে তার পরিচয় ঘটে। জেরি লেখিকাকে প্রতিদিন আগুন পোহানোর কাঠ কেটে দিত। সে ছিল প্রত্যয়ী, পরিশ্রমী এবং অত্যন্ত মেধাবী। জেরি আলাপ প্রসঙ্গে লেখিকাকে জানায়, তার মা জীবিত এবং মাঝে মাঝে তাকে দেখতে ও আসেন এটা সেটা উপহার নিয়ে। গল্পের শেষ পর্যায়ে লেখিকা আশ্রমে চাকুরীরত জনৈক মহিলার কাছ থেকে জানতে পারেন- জেরীর মা, বাবা কেউই আসলে জীবিত নেই এবং তাকে কেউ দেখতে আসার কথা ও ঠিক না। এখানেই গল্পের সমাপ্তি ঘটলে ও পাঠক-পাঠিকার মনে কাহিনীটি একাধিক প্রশ্নের জন্ম দেয়। জেরী কি তাহলে মিথ্যুক? কেন সে ফাঁদিয়ে ওরকম একটি গল্প লেখিকাকে বলতে গেল? সম্ভাব্য ব্যাখ্যা একাধিক- জেরী অনাথ বালক হিসেবে কারো করুণা বা সহানুভূতি নিতে চায়নি। অথবা, লেখিকাকে দেখে তার মায়ের কথা মনে পড়েছে; তাই নিজের একাকিত্ব ও অসহায়ত্বকে চেপে রাখতে কল্পনায় সে একজন মাকে সৃষ্টি করেছে। তা না হলে সম্ভবত তার আত্ম-পরিচয়ের সংকট দেখা দিত।

উপরের গল্পটি বিশেষভাবে মনে পড়ল সম্প্রতি যখন পত্রিকার পাতায় একটি 'বিশেষ' লেখার উপরে চোখ বুলাচ্ছিলাম। উক্ত লেখাটিতে লেখক মরিয়া হয়ে ওঠেছেন দেখাতে যে, আল-কৌরাণের সাথে বিজ্ঞানের বিভিন্ন আবিষ্কারের বিস্ময়কর (?) মিল রয়েছে। বেশ কিছু দেশী-বিদেশী রেফারেন্স ও তিনি টেনে এনেছেন যা বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞান গবেষণার পদ্ধতির সাথে অপরিচিত পাঠক-পাঠিকাদের খুব সহজেই বিভ্রান্ত করতে পারবে; তাঁরা মনে করতে পারেন, কৌরাণ বোধ হয় একধরনের বিজ্ঞানগ্রন্থ। হয়ত এ ও ভাবতে পারেন (বা ভাবেন)- হয়রত মুহম্মদ প্রায় সাড়ে চৌদ্দশ বছর আগে বিজ্ঞানের এমনসব তথ্য জানতেন, যা আধুনিক জগতে বিজ্ঞানীরা পরিশ্রমলব্ধ গবেষণার মাধ্যমে মাত্র জানতে শুরু করছেন! তবে এসব বিশ্বাস মুসলমানদের মাঝে একেবারে নতুন নয়। সেই ছোটবেলা থেকে শুনে আসছি, 'আমাদের কৌরাণেই পৃথিবীর সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান নিহিত রয়েছে। এগুতে পারছি না কেবল শয়তানের ওয়াসওয়াসে।' কিংবা 'কাফির-নাসারারা যে এত উন্নতি করেছে, তা আসলে আমাদের কৌরাণ গবেষণা করে, অথচ আমরা নিজেরা পারছি না সঠিক আমলের অভাবে।' কিন্তু আমাকে আজ পর্যন্ত কেউ কোনদিন বলে দিতে পারলেন না, 'সঠিক আমল' জিনিসটি আসলে কী কিংবা, বক্তা নিজেই বা কেন 'সঠিক আমল'টি অভ্যাস করে কোটি কোটি মুসলমানদের দু'দশা লাঘব করতে সক্ষম হচ্ছেন না। একজন শিক্ষিত মুসলমানদের কলম দিয়ে যখন এসব বালখিল্যতায় ভরা কথা বা লেখা বেরিয়ে আসে, তখন পাঠকের বিভ্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা একটু বেশি বৈকি। কারণ- এঁরা আবার নিজেদের একই সাথে 'আধুনিক' এবং 'পাক্কা মুসলিম' লেবাসে ঢাকতে পারংগম। কেউ কেউ ভাবেন, এসব লেখা মুসলমানদের সামনে এগোনোর পথে অনুপ্রাণিত করবে। কিন্তু আসলে কী তাই? জবাবে বলব, জ্বী-না। বাস্তবতা বড়ই রুঢ়। কৌরাণে যদি বিজ্ঞানের ব্যাপারে এতই ইংগিত থেকে থাকত, তাহলে প্রশ্ন আসে- পৃথিবীর সমস্ত জনসংখ্যার প্রায় এক পঞ্চমাংশ মুসলমান হলে ও বর্তমানে সমস্ত পৃথিবীতে মুসলমান বিজ্ঞানীদের সংখ্যা

কেন এক শতাংশের ও কম? কিংবা, কেন- পৃথিবীর সমস্ত মুসলিম দেশে যত বিজ্ঞানী রয়েছে, অমুসলিম ইসরাইলের একা রয়েছে তার চাইতে দ্বিগুন সংখ্যক বিজ্ঞানী? <sup>\*১</sup> তবে অর্বাচীন শ্রেণীর যেসব লেখকদের কথা বলছি অর্থাৎ, যারা কি-না ধর্মগ্রন্থে বিজ্ঞান খুঁজে পান, তাদের মধ্যে সবাই যে কেবল মুসলমান, তা নয়। খৃস্টানদের মধ্যে ও একদল মূর্খ রয়েছে যারা একইরকম ভাবে বাইবেলে বিজ্ঞানের সূত্র সন্ধান করে বেড়ায়। ঠিক তেমনি, হিন্দুদের মধ্যে রয়েছে তথাকথিত 'বেদিক সাইনস'-এর একদল প্রবক্তা। গত বিজেপি সরকারের আমলে বেদকে বিজ্ঞান শিক্ষায় অন্তর্ভুক্তির দাবীতে পুরো ভারতে এরা রীতিমত ঝড় তুলেছিল। এদের অনেকে এখন ও সে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তবে আমি এই লেখায় মূলতঃ 'কোরাণে বিজ্ঞান' খোঁজার বিষয়টির অন্তসারশূণ্যতা এবং যুক্তিহীনতার দিকেই মনোনিবেশ করব। অন্যান্য ধর্মগ্রন্থে বিজ্ঞান খোঁজার বিষয়ে ইন্টারনেটে সার্চ করলে প্রচুর লেখা পাওয়া যাবে। আমাদের 'মুক্তমনা' হিউম্যানিস্ট ফোরামে ও এই বিষয়ে যথেষ্ট সংখ্যক লেখা রয়েছে। উৎসাহী পাঠক-পাঠিকারা ইন্টারনেটে এই ঠিকানায় ব্রাউজ করতে পারেনঃ [www.mukto-mona.com](http://www.mukto-mona.com)

## দুই: কোরাণে কি অতি বিজ্ঞান লুক্কায়িত?

মনে মনে চিন্তা করছিলাম ব্যাপারটি নিয়ে। এমনটি কেন হয়, বিজ্ঞানীরা যখন কোন কিছু আবিষ্কার করে ফেলেন, কেবল তখনই কতিপয় অন্ধ মুসলমান, খৃস্টান ও হিন্দু মূর্খরা এটি তাদের নিজ নিজ ধর্মগ্রন্থে আছে বলে চোঁচামেচি শুরু করে দেয়, কিন্তু উলটোটি কখনোই দেখা যায় না, অর্থাৎ, কোরাণ-বেদ-বাইবেলের তথাকথিত লুক্কায়িত সূত্র ধরে কেউ আজ পর্যন্ত একটি ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করতে পারেনি? আমাকে কেউ কি মাত্র একটা স্ট্যান্ডার্ড সাইনস জার্নাল (যেমনঃ *Science, Nature, etc*) এর নাম বলতে পারবেন যেখানে বিজ্ঞানী তাঁর রেফারেনসের তালিকায় কোরাণ, বেদ, বাইবেলকে উল্লেখ করেছেন? (আমি গবেষণাধর্মী বিজ্ঞান জার্নালের কথা বলছি; 'বাইবেল-কোরাণ ও বিজ্ঞান' বা, 'মহাগ্রন্থ কোরাণ ও বিজ্ঞান' জাতীয় স্থূল কোন গ্রন্থের কথা বলছি না।) উত্তর খুঁজতে গিয়ে 'এ মাদার ইন ম্যানভিল' গল্পের কথা মনে পড়ল। আমার কাছে ব্যাপারটা বেশ মজার বলে মনে হল। একটু চিন্তা করলে দেখা যাবে, যেসব মুমিন-মুসলমান লেখক কোরাণে বিজ্ঞান আছে বলে চোঁচামেচি করেন, তাঁদের সাথে উপরে উল্লেখিত গল্পের মূল চরিত্র জেরী মননের অদ্ভুত সাদৃশ্য রয়েছে, অন্তত মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে। আপন অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থে বিনয়ী, প্রত্যয়ী এবং বুদ্ধিদীপ্ত হওয়া সত্ত্বেও জেরী যেমন কল্পনায় একজন মাকে সৃষ্টি করেছে- যিনি সন্তানকে ভালবাসেন, উপহারসহ দেখতে আসেন, তার সাথে সময় কাটান; ঠিক তেমনি কতিপয় মুসলমান লেখক-লেখিকা আত্ম-পরিচয়ের সংকট থেকে আপন 'উম্মাহ'-র পরিব্রাজনের উপায় হিসেবে একের পর এক সৃষ্টি করে চলেছেন কোরাণে বিজ্ঞানের অস্তিত্বের গাঁজাখুরি গল্প। এই প্রবণতা একজন মানুষের মধ্যে তখনই তত বেশি দেখতে পাবেন, তার স্বীয় অস্তিত্ব ও পরিচয়ের সংকট যখন যত বেশি হবে। উপরের গল্পে লেখিকার মাতৃসম স্নেহ, ভালবাসা জেরীকে কল্পনায় মা আবিষ্কারের দিকে ঠেলে দিয়েছিল। আর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে অমুসলিমদের বিশাল কর্তৃত্ব কতিপয় মুসলমান লেখক-লেখিকাদের ঠেলে দিচ্ছে কোরাণে বিজ্ঞান খোঁজার দিকে। এই শ্রেণীর কিছু শিক্ষিত মুসলমানদের ভয়াবহ অজ্ঞতার কিছু বাস্তব উদাহরণ দেয়া যাক।

মুসলিম আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধবদের অনেকে আমাকে নিয়ে আক্ষেপ করেন। জানতে চান, ধার্মিক মুসলমান পরিবারে জন্ম নিয়ে ও আমি কেন ধর্মে বিশ্বাস করি না। কেউ কেউ রেফারেনস দিয়ে আমাকে ইম্প্রেস করার চেষ্টা করেন। যেমন- *আরে ভাই, এত বই পড়েন অথচ এটা ও জানেন না, স্বয়ং আমেরিকার একজন মনীষী (?) পর্যন্ত গবেষণা করে রায় দিয়েছে, মহানবী মুহাম্মদ (সঃ) হচ্ছেন সর্বকালের (!) সর্বশ্রেষ্ঠ (!) মহামানুষ (!)।* বিশেষণের ভুল প্রয়োগ দেখে আমি অবাক হই। বুঝতে পারি, অজ্ঞতার চেয়ে ভয়াবহ মানসিক অসুখ ধরনীর বুকে খুব কমই আছে। কারণ আমেরিকার সেই তথাকথিত 'মনীষী'-এর বইটির সরাসরি ইংরেজী ভার্সন আমি পড়েছি, আর এঁদের বেশির ভাগই পড়েছেন এর অসম্পূর্ণ এবং ভুল বাংলা অনুবাদ (যা ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে বাজারে ছাড়া হয়েছে)। বইটি লিখেছেন মাইকেল এইচ, হার্ট (Michael H. Hart) নামের আমেরিকান একজন সাংবাদিক। বইটির তিনি নাম দিয়েছেন *The 100: A Ranking of the Most Influential Persons in History* মাইকেল হার্ট নিজেই বইটির ভূমিকায় (যা অবৈধ বাংলা ভার্সনে অনুপস্থিত) পরিষ্কার করে উল্লেখ করেছেন, তিনি যা করতে চেষ্টা করেছেন তা হচ্ছে ইতিহাসে সর্বাধিক প্রভাব বিস্তারকারী (*The most influential*) লোকজনের একটি তালিকা তৈরী করতে, যার সাথে যে কেউ দ্বিমত পোষণ করতে পারেন এবং যা কোন ক্রমেই 'সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ' বা *The greatest human beings*- এর তালিকা নয়। যেমন- বইটিতে ইতিহাসে সর্বাধিক প্রভাববিস্তারকারী মানুষ হিসেবে সর্বপ্রথমে যেমনি মুহাম্মদকে স্থান দেয়া হয়েছে, তেমনি একই তালিকায় ৩৯নং-এ আছেন স্বয়ং হিটলার! অন্যান্য ব্যতীকিং এ এসেছে স্টালিন, চেঙ্গিস খানদের নাম। মজার ব্যাপার, বইটির অবৈধ বাংলা সংস্করণের সংখ্যা একাধিক এবং টাইটলে বইয়ের নাম এসেছে বিকৃত আকারেঃ *'ইতিহাসের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষদের তালিকা'*। বাঙ্গালী মুসলমানদের মধ্যে অনেক

মুখরা বইটির কেবল বাংলা অনুবাদ পড়েছে, আর ইংরেজীটা ছুঁয়ে দেখলে ও খুব সম্ভবত 'The most influential' এবং 'The greatest men in human history'-এর মধ্যে পার্থক্য বোঝার মত বুদ্ধিমত্তা এদের নেই (হয়ত আল্লাহ ইচ্ছা করেই এদের এরকম করে পৃথীবিতে পাঠিয়েছেন)। তারা অহেতুক রেফারেন্সে আপ্ত হয়। কমবেশি একই রকম অজ্ঞতার প্রকাশ ঘটায় অনেক শিক্ষিত মুসলমান যখন তারা মরিস বুকাইলি নামের সৌদী রাজপরিবারে চাকরী করা একজন খৃস্টান ডাক্তারের (কোন বিজ্ঞানী নয়) একটি বইয়ের বিষয়বস্তুতে। বইটির নামঃ 'Bible, Quran and Science' (বাইবেল, কোরাণ এবং বিজ্ঞান)। মজার ব্যাপার বাইবেল, কোরাণ এবং বিজ্ঞানের এর মধ্যে কোরাণকে চূড়ান্ত সত্য (?) বললে ও মরিস বুকাইলি নিজে কিন্তু মুসলমান হননি। হওয়ার অবশ্য দরকার ও নেই কারণ- জানা গেছে, কোরাণকে আধুনিক পাঠক-পাঠিকার কাছে জনপ্রিয় করার উদ্দেশ্যে সৌদী শাসকরা বুকাইলিকে এই দায়িত্ব দিয়েছিল যে তিনি যেন একটি ইম্প্রেসিভ বই লিখে দেন। বিনিময়ে বুকাইলি পেয়েছেন বিরাট অঙ্কের পেট্রোডলার।

### তিনঃ একটি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের নমুনাঃ

বিজ্ঞান কার্য-কারণ (cause and effect) নীতি, অনুসন্ধান, পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং সলিড গবেষণার ভিত্তিতে এগোয়, কারো ব্যক্তিগত বিশ্বাসের মূল্য নেই এখানে। আর ধর্ম গ্রন্থের পুরো ব্যাপারটাই হচ্ছে অগাধ এবং প্রশ্নহীন বিশ্বাস। তেলে জলে কি আর মেশে? বিজ্ঞানীদের এক-একটি আবিষ্কার প্রকৃত অর্থে বহু বছরের নিরবচ্ছিন্ন অধ্যয়ন, মৌলিক গবেষণা এবং পূর্বসূরীদের একই বিষয়ে রেখে যাওয়া তথ্য-উপাত্তের বিশ্লেষণের মাধ্যমে ঘটে থাকে। এখানে অলৌকিক গ্রন্থাবলির কোন স্থান নেই। তা বলা মানে একজন বিজ্ঞানীর কৃতিত্বকে খাটো করা। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করেছি, ডি-এন-এ (DNA) আবিষ্কারের এর কথা।

ডি-এন-এ অণুর পুরো নাম- ডি অক্সি রাইবো নিউক্লিক এসিড। একে বলা হয় 'জীব দেহের প্রধান অণু' (The master molecule of life)। কেউ কেউ আদর করে ডি-এন-এ-কে ডাকেন 'প্রচার মাধ্যমের প্রেমসী' (The darling of the media)। যাঁরা বিজ্ঞানের ছাত্র/ছাত্রী না, তাঁরা ও জ্বীণ থেরাপি, ক্লোনিং, মানব জিনোম প্রকল্প (Human Genome Project), ইত্যাদির নাম শুনে থাকবেন। এ সবগুলি কাজ ও গবেষণার মূল টাগেট বা অস্ত্র হচ্ছে ডি-এন-এ (যার সাথে জিণের পার্থক্য হচ্ছে- বিশাল দৈর্ঘ্যের একেকটি ডি-এন-এ অণুতে রয়েছে অনেকগুলি আলাদা আলাদা অংশ যা জিণ বলে পরিচিত)। এই ডি-এন-এ-র উপাদান ও গঠন আবিষ্কার করতে বিজ্ঞানীদের সময় লেগেছে প্রায় একশ' বছর। যদি ও ১৯৫৩ সালের জেমস ওয়াটসন ও ফ্রান্সিস ক্রিক এর ডাবল-হেলিক্স মডেল ডি-এন-এ আবিষ্কারের ইতিহাসে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ঘটনা, বায়োলজি বা মলিকুলার বায়োলজির যে কোন ছাত্র/গবেষক মাত্রই জানেন- পূর্ববর্তী বিজ্ঞানীদের গবেষণা এবং পর্যবেক্ষণের সূত্র ছাড়া ১৯৫৩ সালের যুগান্তকারী ঘটনাটি সম্ভব ছিল না। আমি নিচে ডি-এন-এ আবিষ্কারের ক্রোনোলজিকাল সালগুলো উল্লেখ করছি-(সূত্রঃ nature, human genome issue)

- ① ১৮৬৯ সাল - সর্বপ্রথম জীবকোষ থেকে ডি-এন-এ পৃথক করা হয়।
- ② ১৮৭৯ সাল - মাইটোসিস কোষ বিভাজন পর্যবেক্ষণ করা হয়।
- ③ ১৯০০ সাল - জোহান ম্যাডেলের মটরগুঁটি বিষয়ক গবেষণার সন্ধান লাভ।
- ④ ১৯০২ সাল - বংশগতি (hereditary) বিষয়ে ক্রমোজোম তত্ত্বের ধারণার উদ্ভব।
- ⑤ ১৯০৯ সাল - সর্বপ্রথম 'জিণ' শব্দটি চালু হয় (এটি কোরাণে বর্ণিত কোন 'জীন' নয়- লেখক)।
- ⑥ ১৯১১ সাল - ফ্লট ফ্লাই (*Drosophila melanogaster*) নিয়ে গবেষণা ক্রমোজোম তত্ত্বের ধারণাকে শক্তিশালী করে।
- ⑦ ১৯৪১ সাল - এক জিণ-এক এনজাইম তত্ত্বের ধারণা।
- ⑧ ১৯৪৩ সাল - এক্সরে ডিফ্রেকশন (Xray diffraction) টেকনিকের প্রয়োগ করে ডি-এন-এ-র উপর গবেষণা করা হয়।
- ⑨ ১৯৪৪ সাল - ডি-এন-এ ট্রান্সফরমেশন (transformation) নীতির আবিষ্কার।
- ⑩ ১৯৫২ সাল - জিণ যে আসলে ডি-এন-এ দিয়ে তৈরী, তা জানা যায়।
- ⑪ ১৯৫৩ সাল - জেমস ওয়াটসন, ফ্রান্সিস ক্রিক এবং উইলকিনস ডাবল-হেলিক্স মডেল-এর মাধ্যমে ডি-এন-এ-র গঠন ও উপাদান ব্যাখ্যা করেন (সেসময় ওয়াটসনের বয়স ছিল মাত্র ২৩ বছর -লেখক)।
- ১৯৬৩ সালে সে জন্য তাঁদেরকে নোবেল পুরস্কার দেয়া হয়।

প্রিয় পাঠক -পাঠিকা, উপরের উদাহরণ দ্বারা আশা করি বোঝাতে সক্ষম হয়েছি যে, কোরাণ-বেদ-বাইবেলের সাথে বিজ্ঞানের আবিষ্কারের সামঞ্জস্য খোঁজা একধরনে অজ্ঞতা ও আহাম্মকি বৈ অন্যকিছু নয়। অথচ কেউ কেউ তাই করছেন। আর এ হীন কাজে তাদের সংগী হচ্ছেন কিছু স্বার্থান্বেসী, লোভী এবং নাম-নর্বশ্ব প্রচারপ্রিয় বিজ্ঞানী। যেমন- বাংলাদেশে ডঃ শমসের আলী "Scientific Indications in The Holy Quran" নামক বইটির তৃতীয় কভার পেজে কোরাণের একটি আয়াত উল্লেখ করে তার সাথে বড় করে ডি-

এন-এ অণুর ছবি জুড়ে দিয়ে বোঝাতে চেয়েছেন, কোরাণে ডি-এন-এ-র ব্যাপারে পর্যন্ত ইংগিত রয়েছে। আয়াতটি এ রকম-

এবং তোমাদের এবং পৃথিবীর অন্যান্য প্রাণীদের গঠন-প্রকৃতিতে নিশ্চিত বিশ্বাসীদের জন্য রয়েছে সংবাদ (৪৫:৪)

বলুনতো, এর সাথে ডি-এন-এ অণুর সম্পর্কটা কোথায়? এই মুখতার (নাকি, শঠতার) শেষ হবে কবে? এবার জগতত্ত্বের সাথে কোরাণের তথাকথিত মিলের ব্যাপারে একটি উদাহরণ দিচ্ছি।

### দ্রষ্টব্য (Embryology) কি কোরাণ থেকে এমেছে?

কোরাণের বহু জায়গায় বলা হয়েছে, জমাট রক্ত থেকে মানুষের সৃষ্টি করা হয়েছে (২৩:১৪, ৭৫:৩৮, ৯৬:২); যার সাথে বিজ্ঞানের বেমিল ছাড়া কোন মিল নেই। 'জমাট রক্ত' প্রসংগ ঘুরে ফিরে বার বার কেন কোরাণে আসল? এ রকম প্রশ্ন মনে আসতেই পারে। এর উত্তর খোঁজতে হলে আমাদের একটুখানি দৃষ্টি দিতে হবে মুহম্মদ পূর্ববর্তী সমাজ ও ইতিহাসের দিকে। মুহম্মদের জন্ম (৫৭০ খ্রিস্টাব্দ) এরিস্টটলের জন্মের (খ্রিস্টপূর্ব ৩৮৪) প্রায় একহাজার বছর পরে। দর্শন-সাহিত্য-বিজ্ঞান তখন ও (এমনকি এর পরে ও) এরিস্টটলের চিন্তা-চেতনার মধ্যেই আবর্তিত হচ্ছিল। স্বাভাবিক কারণেই এরিস্টটলীয় এ সব ধারণা কম বেশি মুহম্মদকে ও প্রভাবিত করেছিল। এ ক্ষেত্রে মুহম্মদের নিরক্ষরতা বড় কোন বাঁধা হওয়ার কথা নয়। যীশু, গৌতম বুদ্ধ ও নিরক্ষর ছিলেন। জমাট বাঁধা রক্ত (আলাক্কা, আরবীতে) থেকে জন্মের তত্ত্বটি এসেছে মূলতঃ গ্রীকদের কাছ থেকে। এরিস্টটলকে জীব বিজ্ঞানের জনক বলা হলে ও জীব সম্পর্কিত তাঁর অনেক তত্ত্বই কালক্রমে ভুল প্রমাণিত হয়েছে। যেমন- মানব প্রজনন সম্পর্কে এরিস্টটল এই ভ্রান্ত ধারণাতে বিশ্বাস করতেন যে, যৌবনবতী মহিলার ঋতুস্রাব (menstrual blood) এর উপর পুরুষ বীর্যের ক্রিয়ার ফলেই মাতৃগর্ভে শিশুর জন্ম হয়ে থাকে। জমাট বাঁধা রক্ত থেকে জন্মের কোরাণিক তত্ত্বে এরিস্টটলের এই ভ্রান্ত ধারণারই প্রতিফলন ঘটেছে। সন্দেহ নেই, কোরাণের এই ধারণাটি মারাত্মকভাবে ভুল। অথচ অনেক মুমিন এই সত্যকে মেনে নিবেন না কেবলমাত্র এই অন্ধ বিশ্বাসের কারণে- কোরাণ আল্লাহর বাণী, কাজেই ভুলত্রুটির উর্দ্ধে। মূলতঃ ভ্রূণের পর্যায়ক্রমিক বৃদ্ধির বিভিন্ন স্তরে এমন কোন পর্যায় নেই, যেখানে ভ্রূণকে জমাট রক্তের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। কেবলমাত্র একটি পর্যায়ে এই ভুলটি হতে পারে অর্থাৎ, ভ্রূণকে জমাট রক্ত সদৃশ মনে হতে পারে, যখন মিসকারেজ (miscarriage) বা প্রাকৃতিক উপায়ে গর্ভপাত ঘটে। তর্কের খাতিরে ও যদি মেনে নেই ভ্রূণটি জমাট রক্ত সদৃশ, তাহলে ও ভুলে যাওয়া চলবে না- এটি কেবল মৃত ভ্রূণের ক্ষেত্রে ঘটে অর্থাৎ, যেটির আর পূর্ণাঙ্গ মানব শিশুতে রূপান্তরিত হওয়ার কোনই সম্ভাবনা নেই।

জমাট রক্ত আসলে কী, সে সম্পর্কে প্রাণ রসায়নিক (biochemical) ব্যাখ্যাটা এখানে জেনে নেয়া ভাল, যাতে তথাকথিত কোরাণিক বিজ্ঞানের সমর্থকরা মন-গড়া ব্যাখ্যার দ্বারা বার বার আমাদের বিভ্রান্ত করার সুযোগ না পান। আঘাত বা দুর্ঘটনার ফলে রক্তক্ষরণ ঘটলে শরীরে স্বাভাবিক নিয়মেই ক্ষত বা আঘাতের স্থানে রক্ত জমাট বাঁধে। কৈশিক রক্তনালীর (capillary blood vessels) চাইতে বড় যে কোন রক্তনালী থেকে রক্তক্ষরণ ঘটলে জখম বা আঘাতের স্থানে রক্ত জমাট বাঁধে যাতে অতিরিক্ত ক্ষরণ না ঘটেতে পারে। এ ক্ষেত্রে অনুচক্রিকা বা প্লেটলেট (তিন প্রকার রক্ত কোষের একটি) এর ভূমিকা সর্বপ্রধান এবং সর্বপ্রথম। যখন শরীরে কোথাও কোন জখম বা আঘাত ঘটে, স্বাভাবিক অনুচক্রিকাগুলি তখন সক্রিয় অনুচক্রিকায় রূপান্তরিত হয়। এ গুলির তখন আকৃতির পরিবর্তন ঘটে থাকে, এবং এরা আঠালো হয়ে রক্তনালীর দেয়ালে জমা হয়ে প্লাগ (plug) তৈরী করে। এই সক্রিয় অনুচক্রিকাগুলি থেকে একই সময়ে রক্তপ্লাজমায় বিশেষ এক ধরনের রাসায়নিক পদার্থের নিঃসরণ ঘটে থাকে। অনেকগুলি জটিল প্রাণ-রাসায়নিক বিক্রিয়ার সাহায্যে ফাইব্রিনোজেন তখন ফাইব্রিনে পরিণত হয়। ফাইব্রিন হচ্ছে এক ধরনের অদ্রবণীয় প্রোটিন যা ফাইব্রিল নামক অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুতা জাতীয় বস্তুর সমন্বয়ে জটিল জালিকার সৃষ্টি করে। রক্ত কোষ এবং প্লাজমা (উভয়ের সমন্বয়েই রক্ত গঠিত) তখন ফাইব্রিলের এই জালে আটকা পড়ে গিয়ে ক্লট বা জমাট রক্তের সৃষ্টি করে।

### জ্যোতির্বিজ্ঞান (Astronomy), মুসলিম জ্যোতির্বিজ্ঞানী এবং কোরাণ:

গ্রহ-নক্ষত্র এবং জ্যোতিষ্কমণ্ডলী সম্পর্কে 'মহাগ্রন্থ আল-কোরাণের' ব্যাখ্যা একটু পর্যালোচনা করা যাক। কেননা- ভ্রূণ বিদ্যার মত এটি ও 'কোরাণিক বিজ্ঞানী' এবং তাদের পৃষ্ঠপোষক মুমিন বান্দাদের আরেকটি অতি প্রিয় বিষয়। সন্দেহ নেই, আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞান (Astronomy) অনেক মুসলিম মনীষীদের মৌলিক গবেষণা এবং অধ্যয়নের নিকট প্রভূতভাবে ঋণী। উদাহরণস্বরূপ আল-সুফী, আল-বিরুণি, আল-জারকালি প্রমুখ জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের নাম করা যায়। কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না, এসব মনীষীরা কোরাণ-এর সূত্র ধরে কিছুই আবিষ্কার করেননি। কেননা ক্লাসিক্যাল ইসলাম বা স্বর্ণ যুগে (The Golden Age of Islam) মুসলমান



মনীষীরা যতটা না ছিলেন আচার-সর্বস্ব মুসলমান, তার চাইতে অধিক তাঁদের পরিচিত ছিল 'যুক্তিবাদী' মনীষী হিসেবে। এঁদের সম্পর্কে পাকিস্তানের বিখ্যাত নিউক্লিয়ার পদার্থ বিজ্ঞানী এবং কায়েদে-এ-আযম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পারভেজ হুদবাইয়ের মনতব্য প্রণিধানযোগ্য\*<sup>২</sup>:

".....ইসলামের স্বর্ণ যুগে বিজ্ঞান অগ্রগতি লাভ করেছিল কারণ- ইসলামের অভ্যন্তরে তখন সক্রিয় ছিলেন মুতাজ্জিলা নামধারী শক্তিশালী যুক্তিবাদী ঐতিহ্যের ধারক একদল চিন্তাবিদ। "সবকিছুই পূর্ব-নির্ধারিত এবং আল্লাহর কাছে আত্ম-সমর্পণ ব্যতীত মানুষের অন্য কোন উপায় নেই" --নিয়তীবাদীদের এ মতবাদের তীব্র বিরুদ্ধাচারন করে মুতাজ্জিলারা মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। মুতাজ্জিলারা যখন রাজনৈতিক ক্ষমতায় ছিলেন, জ্ঞান তখন সমৃদ্ধি লাভ করেছিল। কিন্তু দ্বাদশ শতাব্দীতে গোঁড়া ইসলামী চিন্তাবিদ ইমাম আল-গাজালির নেতৃত্বে ইসলামী রক্ষনশীলতার পুনর্বির্ভাব ঘটে। আল-গাজালি যুক্তির স্থলে দৈব বাণী এবং স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির স্থলে নিয়তিকে তুলে ধরেন। কার্য এবং ক্রিয়ার (cause and effect) সম্পর্কে তিনি অস্বীকার করেন এই বলে যে, মানুষের ভবিষ্যত জ্ঞানার শক্তি নেই, কেবল ঐচ্ছিকতা এ বিষয়ে অবগত। গণিতশাস্ত্রকে আল-গাজালি 'ইসলাম বিরোধী' এবং 'মানব মনের জন্য ক্ষতিকারক' বলে মন্তব্য করেন। গোঁড়ামির জালে ইসলামের সমৃদ্ধি আটকা পড়ে যায়। মহামতি খলিফা আল-মামুন এবং হারুন-আল-রশিদ এর শাসনামলে রাজদরবারে মুসলিম , খ্রীষ্টান এবং ইহুদী মনীষীদের একত্রে জড়ো হয়ে জ্ঞান-চর্চা এবং মত-বিনিময় করার যে প্রবণতা বহাল ছিল, তা পরবর্তীকালে চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়। মুসলিম বিশ্বে সহিষ্ণু-তা, মেধা এবং বিজ্ঞানের মৃত্যু ঘটে। যুক্তিবাদী ধারার সর্বশেষ মুসলিম মনীষী হচ্ছেন চতুর্দশ শতাব্দীর আবদাল রাহমান ইবনে খালেদুন।"

ক্লাসিক্যাল ইসলাম যুগের অনেক মুসলমান মনীষীর বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ ক্লোরাণের অনেক আয়াতকে 'অযৌক্তিক' এবং 'অবৈজ্ঞানিক' প্রমাণ করেছে। যেমনঃ ক্লোরাণের বর্ণনা অনুযায়ী, সূর্য অস্তমিত হয় একটি 'পঙ্কিল জলাশয়ে' বা muddy spring-এ (১৮:৮৬), তেমনি উদিত হয় একটি বিশেষ স্থান থেকে (১৮:৯০)। আমরা জানি, খালি চোখে সূর্য পূর্বাকাশে উদিত হয় এবং পশ্চিমাকাশে অস্ত যায় বলে মনে হলে ও বিজ্ঞানের বিচারে তা আসলে সত্য নয় কেননা, মহাশূন্যে অবস্থিত রয়েছে আমাদের সৌরজগতটি এবং সূর্য সেটির কেন্দ্র। পৃথিবীসহ অন্যান্য গ্রহ সূর্যকে কেন্দ্র করে যেমন অবিরত ঘুরছে, ঠিক তেমনি এরা নিজেদের কক্ষ পথে হচ্ছে আবর্তিত অর্থাৎ, ঘূর্ণায়মান লাটিমের বেলায় যেমনটি হয়। প্রায় ২৪ ঘন্টায় পৃথিবী নিজস্ব কক্ষপথে একবার ঘুরে। এই কারণে সৌর জগতের কেন্দ্রে অবস্থিত সূর্যের সকল আলো একই সাথে এসে গোলাকার ও ঘূর্ণায়মান পৃথিবী গায়ে এসে পড়তে পারে না। যেখানে পড়ে, সেখানটায় হয় দিন; বাকী জায়গায় অন্ধকার অর্থাৎ, রাত। কিন্তু ক্লোরাণে বর্ণিত গ্রহ-নক্ষত্র সম্পর্কিত বক্তব্যের সাথে বিজ্ঞানের এসব তথ্যের কোন মিল নেই। এর একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক কারণ রয়েছে। গ্রীক ধারণার বশবর্তী হয়ে সে সময় প্রায় সকলে অজ্ঞতাভ্রমে বিশ্বাস করতেন- পৃথিবীর আকার গোলাকৃতি নয়, বরং চ্যাপ্টা; এবং পৃথিবী হচ্ছে মহাবিশ্বের কেন্দ্র (একে বলা হয় এরিস্টটলের ভূ-কেন্দ্রিক মহাবিশ্ব সম্পর্কিত মতবাদ বা geocentric theory of universe)। তবে মুসলিম গণিতবিদ ও জ্যোতির্বিদ আল-বিরুনি সে সময় ও (মৃত্যু ১০৪৮ সাল) বিশ্বাস করতেন যে , ঘূর্ণনশীল মহাবিশ্বের আকৃতি হচ্ছে গোল এবং মোটে ও চ্যাপ্টা নয়। বিজ্ঞানী বলতে হলে তাই আল-বিরুণিকে বলা উচিত, মুহম্মদকে নয়।

উপরের তথ্যগুলি দ্বারা এটি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ হয় যে, ক্লোরাণ আসলে মানুষেরই তৈরী একটি গ্রন্থ। তা না হলে, মহাজ্ঞানী আল্লাহ কি করে সঞ্চেতিসের ভ্রান্ত মতবাদগুলি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ আল-ক্লোরাণের পাতায় নিয়ে আসলেন? ক্লোরাণে এরকম অবৈজ্ঞানিক এবং অসামঞ্জস্য ভর্তি বর্ণনার আর ও অনেক উদাহরণ রয়েছে। ক্লোরাণের একটি আয়াত (২:২৯) অনুযায়ী, আল্লাহ প্রথমে পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর বেহেস্ত বা স্বর্গ সৃষ্টিতে মনযোগ দিয়েছেন। আবার একই ক্লোরাণের অন্য স্থানে (৭৯:২৭-৩০) বলা হয়েছে, প্রথমে স্বর্গ বা বেহেস্ত তৈরীর কাজে আল্লাহ হাত দেন। অতঃপর দিন-রাত এবং সব শেষে পৃথিবী। আরেক জায়গায় বেহেস্ত এবং পৃথিবী তৈরীর মোট সময় সম্পর্কে বলতে গিয়ে আল্লাহ (নাকি, মুহম্মদ?) তালগোল পাকিয়ে ফেলেছেন। যেমনঃ ক্লোরাণের কিছু কিছু আয়াত (৭:৫৪, ১০:৩, ২৫:২৯) অনুযায়ী আল্লাহ সর্বমোট ছয় দিনে বেহেস্ত ও পৃথিবী বানিয়েছেন; কিন্তু একই ক্লোরাণের ৪১:৯ আয়াত অনুযায়ী, আল্লাহ দুই দিনে পৃথিবী তৈরী করেছেন এবং সেখানে প্রয়োজনীয় পরিবেশ তৈরীতে সময় লেগেছে আর ও চার দিন (আয়াত ৪১:১০)। সবশেষে বেহেস্ত তৈরীতে সময় লেগেছে আর ও দুই দিন (আয়াত ৪১:১২ অনুযায়ী) অর্থাৎ, এই হিসেব অনুযায়ী, বেহেস্ত ও পৃথিবী সৃষ্টিতে মোট ব্যয়িত সময় হচ্ছে (২+৪+২) বা, সর্বমোট ৮ দিন। তাহলে বেহেস্ত ও পৃথিবী সৃষ্টিতে সর্বমোট ব্যয়িত সময়ের ক্ষেত্রে মহাসত্য গ্রন্থ আল-ক্লোরাণের কোন বিবরণটি আসলে সত্য? ছয় (৬) দিন, নাকি আট (৮) দিন?

## চার:

বেদ চার-পাঁচ হাজার বছর থেকে পৃথিবীতে আছে, ক্লোরাণের বয়স ও দেড় হাজার বছরের কাছাকাছি ; সেই তুলনায় আধুনিক বিজ্ঞানের বয়স মাত্র কয়েকশ বছর। অথচ দেখুন, বিদ্যুৎ, টেলিভিশন, টেলিফোন, রেল-কার, উড়োজাহাজ, কম্পিউটার- সবই কিন্তু গত দু'তিনশ বছরেই আবিষ্কৃত হয়েছে। কেন 'মহাবিজ্ঞানী' মুহম্মদ

এগুলির একটি ও আবিষ্কার করতে পারেননি? চিন্তা করে দেখুন, সামান্য একটা মোটরযান সে সময় থাকলে উটের পৃষ্ঠে চড়ে সংবাদবাহককে কষ্ট করে রোদ-বৃষ্টি পোহাতে মুহম্মদের সংবাদ নিয়ে এখানে সেখানে যেতে হত না। রিমোট কন্ট্রোলড ফাইটার প্লেন বা মিসাইল থাকলে ঘর থেকে শত্রু নাশ করা যেত, অকারণে মুহম্মদের সাহাবীরা মারা যেতেন না; তাঁর নিজের দস্ত (মোবারক) গুলি ও তিনি খোয়াতেন না শত্রুর পাথরের আঘাতে। তাহলে কেরামতি বলে কিছুই ছিল না! তথাপি মজার ব্যাপার এই- একই মুহম্মদ বিশেষ বাহনে চড়ে সাত-আসমানের উপরে আল্লাহ সুবহানুতা'লা, বেহেস্ত-দোযখ দেখেছেন-এই কাহিনী শুনে মুমিনদের আবেগে চোখে জল চলে আসে, কিন্তু মস্তিষ্কে কোন প্রশ্ন আসে না। কাজেই, কার্য-কারণ (cause and effect) নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানের সাথে কোরাণ-বেদ-বাইবেলকে না মিলিয়ে দু'টোর একটিকে বেছে নিলে অহেতুক প্যাঁচালের হাত থেকে সকলেই রক্ষা পাই।

## বিজ্ঞান (science) বনাম 'ডুঁয়া বিজ্ঞান' (pseudoscience):

এই একবিংশ শতাব্দীতে এসে ও মুহম্মদের শত শত কোটি উম্মত মনে করেন, তিনি সাধারণ রক্ত মাংসের কোন মানুষ ছিলেন না-ছিলেন তথাকথিত নূরের তৈরী (এই কারণে বাংলাদেশে মোল্লারা একবার দাবী তুলেছিল, হাই স্কুলের বাংলা পাঠ্যপুস্তকে সাহিত্যিক এস, ওয়াজেদ আলী লিখিত 'মানুষ মুহম্মদ' প্রবন্ধটি নিষিদ্ধ করার জন্য, যদি ও লেখাটি মুহম্মদের সম্পূর্ণ পক্ষে ছিল), মুহম্মদের আঙ্গুলের ইশারায় চাঁদ দু' টুকরো হয়ে গিয়েছিল, আর ও কত কী! দেশেতো বটেই, এমনকি প্রবাসে ও বাংলায় মুমিনরা এসব বয়ান শোনার জন্য সাঙ্গদী জাতীয় মোল্লাদের হাজার হাজার পাউন্ড-ডলার খরচ করে ভাড়া করে নিয়ে আসেন। সম্প্রতি আমরা জেনেছি, কেবল সৌরজগতের একা (মিলিয়ন মিলিয়ন সৌরজগৎ নিয়ে তৈরী এক- একটি গ্যালাক্সী আর মহাবিশ্বে এ রকম বহু বিলিয়ন বিলিয়ন গ্যালাক্সি রয়েছে। আমাদের সৌরজগত মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সীতে অবস্থিত) রয়েছে কমপক্ষে ২১ টি উপগ্রহ বা চাঁদ (সূত্র: ন্যাশনাল জিওগ্রাফী)। নিশ্চয় সে সময় এই ২১ টি চাঁদের খবর জানা থাকলে আজ আমরা শুনতাম- মুহম্মদের আঙ্গুলের ইশারায় ২১টি চাঁদ দু' টুকরো হয়ে গিয়েছিল! উম্মতদের তখন নিশ্চয় সারা জীবন চোখের জল ফেলতে হত ভাবাবেগের ঠেলায়।

প্রশ্ন হচ্ছে, কোন বিষয়টি বিজ্ঞান আর কোন বিষয়টি বিজ্ঞান নয়- এ ব্যাপারটি একজন সাধারণ মানুষ বুঝবেন কি করে? বিষয়টি সুরাহার জন্য বিশ্বজনীন বিজ্ঞান গবেষণার অনেকগুলি নীতিমালা(criteria) চালু আছে। এদের একটি, যাকে ইংরেজীতে replicability বলা হয়, হচ্ছে গবেষণার ফলাফলের অভিন্নতা। ব্যাপারটি হাইপোথেটিক্যালি একটু ব্যাখ্যা করা যাক। ধরুন, কেউ একজন দাবী করে বসলেন, তিনি ক্যান্সার বা এইডস নিরাময়ের একটি ওষুধ পেয়ে গেছেন এবং সেটি ১০০% কার্যকরী। এখন লোকটির সেই দাবী কি একজন বিজ্ঞানী মেনে নিবেন নাকি, স্নেফ পাগলামি বলে বাতিল করে দিবেন? এই ক্ষেত্রে একজন বিজ্ঞানী পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং গবেষণা ছাড়া কোন মনতব্যই করার অধিকার রাখেন না। কিন্তু প্রশ্ন হল, পরীক্ষা করতে হলে তাঁকে কিভাবে এগুতে হবে? এই ক্ষেত্রে যিনি ওষুধটি আবিষ্কার করেছেন, তাঁকে প্রয়োজনীয় তথ্যের যোগান দিতে হবে। তবে গোপনে তা করতে হবে না। যে কোন স্ট্যান্ডার্ড সাইন্স জার্নালে তিনি ওষুধটি আবিষ্কারের পদ্ধতি এবং কার্যকারিতা বিষয়ে যেসব রোগীদের উপর গবেষণা চালিয়েছেন, সেসবের সংশ্লিষ্ট বিবরণ এবং উপাত্ত (statistical data) ছাপাবেন। এখন অন্য আরেকজন বিজ্ঞানী (পৃথিবীর যেকোন প্রান্তের) একই পদ্ধতি এবং পরিবেশে গবেষণা করে যদি ওষুধটির কার্যকারিতার বিষয়ে একইরকম বা প্রায় কাছাকাছিরকম সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেন, কেবল তখনই একজন বিজ্ঞানী বলতে পারবেন- ক্যান্সার বা এইডসের ওষুধটি আসলেই একটি নতুন আবিষ্কার এবং ১০০% কার্যকরী। এরই নাম replicability। হযরত মুহম্মদের কথিত 'মিরাজ'-এর কাহিনী, বা যীশুর 'পুনরুত্থান'-এর কাহিনী বিজ্ঞান দ্বারা সমর্থিত নয়, কারণ এটি কখনোই কোন বিজ্ঞানী কর্তৃক তাত্ত্বিক বা ব্যবহারিক- কোন ভাবেই প্রদর্শন বা প্রমাণ করা সম্ভব নয়। একই রকম কথা বলা যায়- 'স্বপ্নে পাওয়া গাছ দিয়ে চিকিৎসা' জাতীয় পত্রিকার পাতায় প্রকাশিত পীর-তান্ত্রিক-বাবাদের প্রতারণামূলক বিজ্ঞাপণ সম্পর্কে। নর্থ আমেরিকার বিখ্যাত ম্যাজিসিয়ান (যিনি 'মুক্তমনা'র একজন লেখক ও বটে) জেমস র্যান্ডির এ বিষয়ে একটি মজার চ্যালেঞ্জ আছে। যে কেউ বিজ্ঞানের নীতিমালা মেনে নিয়ে অলৌকিকত্ব বা সুপারন্যাচারাল বিষয়ে প্রমাণ দিতে পারলে নগদ এক মিলিয়ন ডলার পুরস্কার পাবেন।\*<sup>৩</sup> আমাদের দেশের তথাকথিত 'পীর' এবং 'আধ্যাত্মিক সাধক-সাধিকারা' চাইলে র্যান্ডির সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। ভারতের পশ্চিম বংগে প্রবীর ঘোষ ও অনুরূপ চ্যালেঞ্জ দিয়ে রেখেছেন বহুদিন থেকে। বাংলাদেশের জনপ্রিয় ম্যাজিসিয়ান জুয়েল আইচের ও এ ব্যাপারে একটি ঘোষণা আছে। ল্যাবটরিতে কেউ আতিপ্রাকৃতিক ব্যাপারের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে পারলে তাকে একাধিক লক্ষ টাকা (একজাকট ফিগারটা এই মুহূর্তে আমার মনে পড়ছে না- লেখক) পুরস্কার দেয়া হবে। বাংলাদেশে হাজার-হাজার পীর-ফকির-তান্ত্রিকদের কেউই আজ অবধি জুয়েলের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছে বলে আমার জানা নেই। অথচ এঁরা প্রতিনিয়ত পত্রিকায় প্রতারণামূলক বিজ্ঞাপণের মাধ্যমে হতাশাগ্রস্ত ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন পাবলিকের কাছ থেকে লক্ষ লক্ষ

টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে। মূল প্রসঙ্গে ফিরে যাই।

প্রশ্ন আসতে পারে, বিজ্ঞানীদের পর্যবেক্ষণ-পরীক্ষায় কি ভুল হতে পারে না? কিংবা, বিজ্ঞানের কথাই কি সর্বদা ধ্রুব সত্য বলে মানতে হবে? উত্তরে বলবঃ বিজ্ঞানীদের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় অবশ্যই ভুল হতে পারে, অনেক সময় হয় ও; কিন্তু একজন বিজ্ঞানী বা তাঁর তত্ত্বকে যদি অন্য আরেকজন বিজ্ঞানী বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি (পরীক্ষা-নিরীক্ষা-পর্যবেক্ষণ এবং গবেষণা) দ্বারা প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে ভুল প্রমাণ করতে পারেন, তাহলে প্রথম বিজ্ঞানীকে নতুন তথ্য-উপাত্ত-ফলাফলের ভিত্তিতে তার থিওরী অবশ্যই পর্যালোচনা করতে হবে- তা তিনি প্রফেসর স্টিফেন হকিংস বা ডঃ কদম আলী, যে-ই হোন না কেন। বিজ্ঞানের যে বৈশিষ্ট্যটি যুক্তিবাদী ও মানবতাবাদীদের বেশি আকৃষ্ট করে থাকে, তা হচ্ছে এই ব্যাপারটি। সে জন্যই বলেছি, বিজ্ঞানে ব্যক্তিগত মতামতের মূল্য নেই। ধর্মগ্রন্থের সাথে বিজ্ঞানের এটিই মূল তফাৎ। ক্বোরাণ অপরিবর্তনীয়, অলংঘনীয়; বিজ্ঞান তা নয়, কেননা পরিবর্তনশীলতা হচ্ছে প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য আর সতত পরিবর্তনশীল সেই প্রকৃতির রহস্যের উন্মোচন হচ্ছে বিজ্ঞানের মহান লক্ষ্যের একটি।

## শেষ কথাঃ

ধর্ম সম্পর্কীয় ভ্রান্ত বিশ্বাস এবং অতি-প্রাকৃতিক কাহিনী সম্পর্কে নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করলে অনেকে আমাকে প্রায়শই এই বলে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করেনঃ *ভাই, যার যার বিশ্বাস তাঁর কাছে। কেন খামোখা মানুষের বিশ্বাসে আঘাত করে তাঁদের কষ্ট দেন?* বলতে ইচ্ছা হয়, মানুষকে অহেতুক কষ্ট দিয়ে যাঁরা চিন্তে সুখ অনুভব করেন, তারা *স্যাডিস্ট* এবং আমি মোটে ও তাদের একজন নই। তবে কেন আমি ক্বোরাণ এবং বিজ্ঞান সম্পর্কে এতসব কথা লিখছি? এতে কি ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের মনে আঘাত লাগতে পারে না? প্রশ্ন আসতেই পারে। আর তার জবাব ও রয়েছে।

মুসলমানরা সংখ্যায় পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার প্রায় এক-পঞ্চমাংশ। মোটে ও চট্টিখানি কথা নয়। এক বিলিয়নের মত মুসলমানদের ঘরে শিশু-কিশোর-কিশোরীদের সংখ্যা কত হত পারে? নিশ্চয়ই তা সংখ্যার মাপে বিশাল এবং গুরুত্বপূর্ণ। এখন এই কয়েক শত কোটি শিশু-কিশোরেরা কি করে বিজ্ঞান শিক্ষায় শিক্ষিত হবে যদি তাদের মাতা-পিতা, গুরুজনদের সকলেই বিশ্বাস করেন যে, আল-ক্বোরাণেই রয়েছে বিজ্ঞান এবং হযরত মুহম্মদ একজন 'মহাবিজ্ঞানী' ছিলেন? তাঁরা কি জবাব দেবেন (বা দিচ্ছেন) যদি তাদের স্কুল পড়ুয়া ছেলেমেয়েরা বিজ্ঞানের ক্লাশ এটেন্ড করে এসে জিজ্ঞাস করেঃ *আচ্ছা, আব্বু-আম্মু, বিজ্ঞানের কার্য-কারণ (cause and effect) নীতির সাথে ক্বোরাণে বর্ণিত আদম-হাওয়া-শয়তান, ফুঁক দিয়ে পৃথিবী সৃষ্টির ব্যাপারটি কি মেলে? কিংবা, ঝড়-বৃষ্টিতো প্রাকৃতিক কারণে ঘটে থাকে, এর সাথে ফেরেস্তা মিকাইলের কি সম্পর্ক?* আমার খুব জানতে ইচ্ছা হয়, মুসলমান বাবা-মায়েরা এসব প্রশ্নের উত্তরে কি বলেন তাদের সন্তানদের। তাঁরা কি বলেন, *'বিজ্ঞানের ক্লাশে যা শিখেছো সব মিথ্যে আর ক্বোরাণের বর্ণনাই সত্যি?'* নাকি, *'বিজ্ঞান এবং ক্বোরাণ দুটোই সত্যি?'* এই দুটো উত্তরই মিথ্যা। আমার বিশ্বাস, সকলে না হলে ও মুসলমান মাতা-পিতার অন্তত কেউ কেউ সন্তানদের সামনে সত্য গোপন করাটাকে প্রশ্রয় দেন না এবং সরাসরি বলে দেন, *'কার্য-কারণ নীতি'র উপর প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানের সাথে ক্বোরাণের কোন মিল নেই। মিল খোঁজার চেষ্টা করা বৃথা। এ দুটো সম্পূর্ণ আলাদা দুটি বিষয়।* যে সব মাতা-পিতা এই সত্যটি তাঁদের সন্তানদের কোন রাখ-ঢাক ছাড়াই বলার ক্ষমতা রাখেন, তাঁরা কেবল নিজেদের সন্তানদের সত্য, সুন্দর এবং বিজ্ঞানধর্মী মানসিকতা বিকাশের পথটিই সুগম করেন না; তাঁরা এ ক্ষেত্রে মানবতার ও একটি উপকার করছেন। কেননা, আমরা সবাই জানি, আগামী দিনের সুন্দর পৃথিবী বিনির্মাণের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে কাজটি আমরা আজই শুরু করতে পারি, তা হচ্ছে- আমাদের নতুন প্রজন্মকে সত্য, সুন্দর এবং বিজ্ঞানের আলোয় আলোকিত করা।

ভালোবাসা রইল সবার প্রতি।

-----

নিউইয়র্ক

২১ অক্টোবর ২০০৬

লেখকের পরিচয়ঃ মুস্তফা হিউম্যানিস্ট ফোরামের কো-মডারেটর এবং সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য। বায়োটেকনোলজিতে মাস্টার্স।

তথ্য তালিকাঃ

1 Islam and Science: Religious Orthodoxy and the Battle for Rationality by Pervez Hoodbhoy

2 Pervez Hoodbhoy, "Muslims and the West After September 11," Washington Post (2002).

3 www.randi.org

উৎসাহী পাঠক-পাঠিকাদের জন্য নিচে উপরের আলোচনার সাথে সম্পর্কিত কিছু ওয়েবসাইটের উল্লেখ করছি। লক্ষ করুন, এগুলি কোনক্রমেই এ বিষয়ে পূর্ণাংগ কোন তালিকা নয়।

- ❖ [www.mukto-mona.com](http://www.mukto-mona.com) (অভিজিৎ রায়ের উদ্যোগে বাংলাদেশের জনাকয়েকজন প্রবাসী বাঙালী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণ এশিয়া এবং অন্যান্য দেশের মানবতাবাদীদের অন্যতম বৃহৎ ওয়েবসাইট)
- ❖ [www.secularislam.org](http://www.secularislam.org) (ক্বোরান, হাদিস এর উৎস, অন্তর্গত অসংখ্য গোঁজামিল-এর প্রমাণ এবং ইসলামের ইতিহাসের অনেক বিদ্রোহী ও যুক্তিবাদী মনীষীদের রচনা সমৃদ্ধ একটি ওয়েবসাইট)
- ❖ [www.csicop.org](http://www.csicop.org) ( বিজ্ঞান, এর কার্য প্রণালী এর সাথে বিজ্ঞানের নামে প্রচারিত অসংখ্য ভুঁয়া বা অতিপ্রাকৃত বিজ্ঞানের পার্থক্য এবং ব্যাখ্যা বিষয়ক ওয়েবসাইট )
- ❖ [www.skeptic.com](http://www.skeptic.com) (উপরের মত)
- ❖ <http://www.wvinter.net/~haught/> (উপরের মত)
- ❖ <http://science-education.nih.gov/home2.nsf/> (বিজ্ঞান শিক্ষা বিষয়ে সহজে বোধগম্য একটি ওয়েবসাইট)